ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
ষোড়শ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০০, আশ্বিন ১৪০৭

বাংলাদেশে বনোজাড় ও তার পরিবেশগত প্রভাব

ডাঃ ইসরাত হাফিজ *

Deforestration and its impact on environment in Bangladesh.

Dr. Israt Hafiz *

Abstract. Forests have played a crucial role in the economic and social development of mankind. They provide food, fuel, furniture and materials for shelter and they also play a vital role in protecting and maintaining the stability of the natural environment. In Bangladesh the Forest ecosystem is deteriorating rapidly. Existing resources are heavily overexploited. Forest and woody vegetation's are being destroyed indiscriminately. As the country has been suffering from cronic food shortage which compile us to import 2 million tons of food grains every year. Moreover long time effects includes loss of boomers as well as of plant and animal species, greenhouse effects, savanization, soil erosion etc. So, it is high time to combat against the vanishing forest.

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, আমাদের অস্তিত্বসহ সবকিছু নিয়েই পরিবেশ। বিশেষজ্ঞদের ভাষায় পরিবেশ হচ্ছে "The sums total of all conditions and influences that affect the development and life of organisms" । ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পানি, বায়ু, ভূমি ও ভৌত সম্পদ এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবিত প্রাণীর সাথে এদের আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করে। সুতরাং পরিবেশ হচ্ছে সকল সামাজিক, ভৌত, জৈবিক এবং পরিবেশগত উপকরণের যোগফল।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক এবং মানুষ সৃষ্ট বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে যেমন- ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিল্প দূষণ, রুগ্ন স্বাস্থ্য, বনোজাড়, মরুকরণ, জলবায়ুর পরিবর্তন, লবণাক্ততা, বৃক্ষ ও প্রাণীকূলের বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত করা

---

* প্রশিক্ষণার্থী, পঞ্চবিংশতিতম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রম, বিপিএটিসি এবং সহকারী প্রধান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ইত্যাদি। জনসংখ্যা, পরিমিত বনসম্পদের অবস্থা এবং দূষণমাত্রা- এই তিনটি চলকের উপর নির্ভর করে নিউজ উইক পত্রিকা বিশ্বের ৩০টি দেশ চিহ্নিত করে যাদের পরিবেশগত অবস্থা সবচেয়ে খারাপ অথবা ভাল। তম্মধ্যে বাংলাদেশের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে অরক্ষিত বলে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে রিপোর্টটি কোষ্টারিকা, ফ্রান্স, ইসরাইল এ তিনটি দেশের পরিবেশগত অবস্থাকে সবচেয়ে ভাল বলে চিহ্নিত করে।

টেকসই উন্নয়নের (Sustainable Development) ধারণা আসার সাথে সাথে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, নগরায়ন ও বিশ্বব্যাপী বনোজাড়ের ফলে বিশ্ব পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন। অপরিণামদর্শী বনোজাড়ের ফলে বিশ্বের আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে দারুণভাবে। তাই পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বনায়নের ভূমিকা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে বনোজাড়ের স্বরূপ নির্ধারণ এবং প্রকৃতিতে এর আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বনসম্পদ সংরক্ষণ ও বনায়ন কার্যক্রমের সফলতা এবং ব্যর্থতার দিকটিও তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল ও পরিবেশ

ক্ষুধা, দারিদ্র, সম্পদের অপ্রতুলতা, ঘনবসতি, দুর্নীতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বাংলাদেশ। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা নীতি নির্ধারণ ও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এই বিপন্ন পরিবেশ রক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশ ব্যতীত আমরা টেকসই উন্নয়ন অর্থাৎ Sustainable Development-এর দিকে এগিয়ে যেতে পারিনা। বিপন্ন পরিবেশের প্রভাব ইতোমধ্যেই আমাদের উপর পড়তে শুরু করেছে। সুতরাং পরিবেশ বিনষ্টের কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের সময় এখনই। পরিবেশ সংরক্ষণের প্রাক্কালে আমাদের বনজ সম্পদ ও তার সংরক্ষণ প্রতিটি নাগরিকের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার। তন্মধ্যে বনাঞ্চল ২১,৪৩৩ বর্গ কিলোমটির যা মোট আয়তনের শতকরা ১৫ ভাগ। সারাদেশে এই বনাঞ্চলের বন্টন সুষম নয়। বেশিরভাগ বনাঞ্চলই দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। অল্প কিছু বনাঞ্চল মধ্য ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তবে ecological ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যে কোন দেশে শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশে তা ন্যূনতম চাহিদার অনেক কম। তদুপরি ৬৪ জেলার মধ্যে ২৮টি জেলায় কোন বনাঞ্চল নেই। কেবলমাত্র ৬টি জেলায় ecological ভারসাম্য রক্ষার করার মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ বনভূমি আছে। সেগুলো হলোঃ খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও রাঙামাটি। দেশের জনসংখ্যার বিস্তরণ অনুসারেও বনাঞ্চলের বন্টন খুবই অসম (সারণী ১)।

সারণী ১। জনসংখ্যা ও বনাঞ্চলের বন্টন

এলাকা (বিভাগ)	জনসংখ্যা (%)	বনাঞ্চলের পরিমাণ (%)
১। রাজশাহী	২৪	২
২। ঢাকা	৩০	৭
৩। খুলনা	২৩	৪২
৪। চিটাগাং	২৬	৪৯
মোট	১০০	১০০

বনাঞ্চলের শ্রেণী বিন্যাস (প্রকৃতি অনুসারে)

প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সমতল ভূমির শালবন ও গ্রামীণ বন।

ক) পাহাড়ী বনঃ এ জাতীয় বন পার্বত্য জেলাসমূহ (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন), চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলাসহ দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। পাহাড়ী বনভূমির মোট আয়তনের ৭০ শতাংশ মাত্র বৃক্ষাচ্ছাদিত এবং এরও বেশ কিছুটা নিম্নমানের। কৃত্রিম পুনর্জন্ম অনুসরণের মাধ্যমে 'ক্লিয়ার ফেলিং' প্রক্রিয়ায় এই প্রজাতির বন ব্যবস্থাপিত হয়।

অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি পাবর্ত্য জেলাগুলোতে অবস্থিত। স্মরণাতীতকাল থেকে অনিয়ন্ত্রিত জুমচাষের ফলে এতদাঞ্চলের বণভূমি সম্পূর্ণ বৃক্ষবিহীন হয়ে পড়েছে। ভূমিক্ষয়ের হারকে বাড়িয়ে দিয়েছে তীব্রভাবে। যার ফলে সম্পূর্ণ এলাকাটি পরিণত হয়েছে একটি অনুৎপাদনশীল ভূমিতে। ক্রমাগত ভূমিক্ষয়ের কারণে এলাকার নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাচ্ছে; প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে বনসম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে এবং দেশের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন উৎস কাপ্তাই হ্রদের আয়ুস্কাল সীমিত হয়ে আসছে। এ জাতীয় বনাঞ্চলের প্রধান জাতসমূহ গরান, চাপালিশ, সিভিট, চম্পা, তেলসুর, গামার, তুন, ঢেকিজাম, কড়ই, টিক, প্রভৃতি।

খ) প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনঃ বৃহত্তর খুলনা ও পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন আর্থিক দিক থেকে বাংলাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অরণ্য। এ বনাঞ্চলের প্রধান জাতসমূহ সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, বিন, গরান, পশুর, গোলপাতা প্রভৃতি। ম্যানগ্রোভ বনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু চকোরিয়া সুন্দরবন বা উপকূলীয় বনাঞ্চল। বিগত ২৫ বছরে এর ৪৩ শতাংশ বনাঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, অতিরিক্ত বনাহরণ, চিংড়ি চাষ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অন্যান্য নানা কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জোয়ারের স্তর হ্রাস, ঘন ঘন প্লাবন ইত্যাদি এ বনোজাড়ের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত। উপকূলীয় অঞ্চলে বনোজাড়ের কারণে ঝড় জলোচ্ছ্বাসজনিত ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ অঞ্চলে ব্যাপক বনায়নের মাধ্যমে তা কমিয়ে আনা সম্ভব। উল্লেখ্য বর্তমানে সরকারিভাবে উপকূলীয় বনাঞ্চলের বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে।

গ) **সমতল ভূমির শালবনঃ** বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর জেলায় এ বনভূমি অবস্থিত। এ বনাঞ্চলের প্রধান জাতসমূহ হচ্ছে শাল, কড়ই, হলদা, ভাদী, বহেড়া,আমলকী প্রভৃতি। এ এলাকার বনভূমির মাত্র ৩২ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত। এ বনের ৯৫ হাজার ৫শত ৫৬ একর এলাকা বেদখল হয়ে গেছে। এ অবস্থা নিরসনে সরকার ১৯৭২ সালে সকল প্রকার সরকারি বনভূমি থেকে বনোৎসাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। স্থানীয় ক্ষমতাশালী ও লোভী লোকের হাতে এর পরেও চলেছে বনের নিধনযজ্ঞ।

ঘ) গ্রামীণ বনঃ সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, ফলের গাছ ও বাঁশ প্রভৃতি নিয়ে গ্রামীণ বন। কুটির শিল্প ও ছোট ছোট কাঠভিত্তিক শিল্পে কাঁচা মালের যোগান দিতে গিয়ে গ্রামীণ বন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশ সবুজ ঘেরা হলেও অর্ধেক এলাকায়ই কোন বনাঞ্চল নেই। তাই দেশে বনসম্পদের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক অপ্রতিরোধ্য আর্থ-পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অবশ্য চলতি অবস্থা বিরাজ করলে বর্তমান প্রজন্মও এ হুমকীর বাইরে নয়।

বনোজাড়ের কারণ

পৃথিবীর সবচেয়ে জন অধ্যুষিত দেশের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং পরবর্তীতে বনের এই নিধনযজ্ঞ, বিশেষত গ্রামীণ বনোজাড় বেড়ে চলে আরো দ্রুতগতিতে। বিশ্বব্যাপী বনোজাড়ের প্রকৃতি ও তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ। এই ভয়াবহ বনোজাড়ের কারণসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা;

খ) দারিদ্র্য;

গ) ভূমিহীন জনসাধারণের বনাঞ্চলে আবাসন;

ঘ) পরিবর্তিত চাষাবাদ ও জুমচাষ (পার্বত্য জেলাসমূহে);

ঙ) পশুখাদ্য (Grazing) ও আগুন;

চ) বনজসম্পদের চুরি ও অননুমোদিত নিধনযজ্ঞ;

ছ) জ্বালানী সংগ্রহ;

জ) অনিয়ন্ত্রিত ও ধ্বংসাত্মক নগরায়ণ প্রক্রিয়া;

ঝ) রাস্তাঘাট, বাঁধ, মিল-কারখানা, খনিজ উত্তোলন কর্মসূচি;

ঞ) হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশাল বনাঞ্চলের ধ্বংসসাধন;

ট) রিফিউজিদের পুনর্বাসন।

বনোজাড় নানাভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশকে বিপন্ন করে। বনোজাড়ের অসংখ্য কারণের মধ্যে নিম্নে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ ও প্রকৃতিতে এর প্রভাব বর্ণনা করা হলোঃ

জুমচাষ ঃ অনিয়ন্ত্রিত জুমচাষের ফলে পাহাড়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি সম্পূর্ণ বৃক্ষবিহীন হয়ে পড়েছে; ভূমিক্ষয়ের হারকে বাড়িয়ে দিয়েছে তীব্রভাবে। বর্তমানে তের ধরনের বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বা এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ রত। প্রায় ৬০,৪০০ পরিবারসহ ৩৫০,০০০ জনসংখ্যা এই চাষ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। একইভাবে শালবনসহ সমতল ভূমির বনাঞ্চল কেটে চাষাবাদ করা হচ্ছে। বর্তমানে সমতল এলাকার শালবনের মাত্র ৩০ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদিত। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চলের মাত্র ৬১ শতাংশ এলাকা উৎপাদনশীল বনভূমি হিসেবে বিবেচিত; বাকী এলাকা ঝোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম বা তৃণ আচ্ছাদিত অথবা সম্পূর্ণ বিরানভূমি। প্রকৃতি ও অবস্থান ভেদে বনভূমির বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৩০ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ। বৃক্ষাচ্ছাদিত বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাসের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা। বিগত এক দশকের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতি দুর্যোগ প্রবণতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পললায়ন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা বেড়েছে আশংকাজনকভাবে।

জ্বালানীঃ উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে জ্বালানীর ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন আসলেও তৃতীয় বিশ্বের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কাঠ ও জ্বালানী হিসেবে

বনজ সম্পদের ব্যবহারই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও নানা খনিজ পদার্থ ও জ্বালানী শক্তির আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও এখনও বনজ জ্বালানীই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জ্বালানীর প্রধানতম উৎস।

পশুখাদ্য (Grazing) এবং আগুনঃ গবাদি পশু ও অন্যান্য বন্য পশু খাবার যোগান দিতে গিয়ে বনাঞ্চলে গাছের পরিমাণ সাংঘাতিকভাবে কমে গিয়েছে। বিশেষ করে শুকনো এলাকায় ফরেস্ট গ্রেজিং অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। বনোজাড়ের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে আগুন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটা হয়ে থাকে মানুষের কারণেই। যেমন পরিবর্তিত চাষাবাদের জন্য জমি পরিস্কার করার জন্য আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।

বনসম্পদের পরিবেশ গুরুত্ব

প্রতিবেশগত প্রভাবঃ বনসম্পদ জীবন প্রতিপালন পদ্ধতির (Life support System) একটি অবিচ্ছেদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় অংশ। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ ছাড়াও সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে বনসম্পদের নান্দনিক দিকগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যেমন বনভূমি প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বন্যা, খরা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে ও বায়ুশোধন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিস্তৃত সবুজ-চত্বর (বনভূমি) শুধূ ঐ এলাকায় বায়ুকেই প্রভাবিত করে তা নয়, বরং বায়ুর গতি ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়াও ঘনীভবনের মাধ্যমে বায়ুতে অবস্থিত দূষিত পদাথের পরিবহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং বৃষ্টিপাত, কুঁয়াশা ও তুষারপাত ইত্যাদি মাধ্যমে বায়ু শোধনে সহায়তা করে। পরিমিত বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে ঘনবসতি এলাকার পরিবেশ প্রতিবেশ এবং আবহাওয়া ও জলবায়ু সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা নিরসন করা যায়।

গ্রীন হাউস প্রভাবঃ গ্রীন হাউস প্রভাব পরিবেশ সচেতনদের কাছে অতি পরিচিত। বহুল আলোচিত "গ্রীন হাউস প্রভাব" প্রশমিতকরণে বনের ভূমিকা অপরিসীম। গ্রীন হাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্যাসের ৪৯শতাংশ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO^2)। শুধু বিশ্বের বনাঞ্চল সংরক্ষণ বা অধিকতর বনায়নের মাধ্যমে পৃথিবীকে এর প্রভাব থেকে মুক্ত করা যাবে না সত্যি কিন্তু যেহেতু বনায়নের

মাধ্যমে উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া O^2 তৈরী করে তাই এর প্রতিক্রিয়া উপশম করা সম্ভব। পৃথিবীকে গ্রীন-হাউস প্রভাব থেকে বাঁচাবার অন্যতম তিনটি পদক্ষেপ হচ্ছে বনাঞ্চল সংরক্ষণ, অধিকতর বনায়ন ও জ্বালানী ব্যবস্থার উন্নয়ন।

গাছপালা ও বনাঞ্চল পশুপাখি এবং জীবজন্তুর স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল। গাছপালা ও বনাঞ্চল উজাড়ের ফলে পশুপাখি ও জীবজন্তুর খাদ্যচক্র ভেঙ্গে পড়ছে ও স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল কমে যাচ্ছে। ফলে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অনেক প্রজাতি এবং জৈব বৈচিত্র ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে জৈব পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পাললায়ন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা বেড়েছে আশংকাজনকভাবে। তুলনামলক উচ্চভূমিতে অবস্থিত হলেও উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলো প্রায়শই ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে। পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হয়েছে ভয়াবহ মরুকরণ প্রক্রিয়া।

বনাঞ্চল কমে যাওয়ায় মাটির ক্ষয়রোধক ক্ষমতা কমে যায় এবং মরুময়তা দেখা যায়। একই সাথে ক্ষয়রোধক ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় উপ সয়েল অর্থাৎ হিউমাস কমে যায়। ফলে মাটির উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়, উদ্ভিজ্জহীনতা বৃদ্ধি পায় এবং দিবা-রাত্রির তাপমাত্রার তারতম্য বৃদ্ধিসহ আবহাওয়ার চরমভাবাপন্ন প্রবণতা বেড়ে যায়।

বন পরিস্থিতি এবং তার আর্থ-পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব

বিশ্বব্যাপী বনোজাড়ের প্রকৃতি ও তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ। গহীন অরণ্যাঞ্চল বলে আফ্রিকা মহাদেশের যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছিল আজ তা' বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দেখা দিচ্ছে প্রচন্ড জ্বালানী সংকট, বিস্তৃতি ঘটছে সাহারার; খরা, বন্যা, ভূমিক্ষয়, ভূমিধ্বস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বাড়ছে বিশ্বব্যাপী। বনোজাড়ের বর্তমান অবস্থা অব্যাহত থাকলে দু'হাজার সাল নাগাদ ফিলিপাইনস-এ আর কোন বনভূমি থাকবে না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে জন অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশ। বনোজাড়ের ফলে দেখা দিয়েছে খাদ্য স্বল্পতা। বনজ জ্বালানীর অভাবে কৃষিজ দ্রব্যাদি ও পশুর গোবর ব্যবহৃত হচ্ছে জ্বালানী হিসেবে। তাই প্রাকৃতিক সারের অভাবে কৃষির উৎপাদন দিনে দিনে কমে আসছে এবং ব্যবহার বাড়ছে কৃত্রিম সারের যা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। বনজ সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বনজ সম্পদের ব্যবহার সংকোচন করতে হচ্ছে। কাগজ কলগুলোতে কাঁচামাল সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় কমতে থাকার ফলে দেখা দিচ্ছে কাগজ সংকট।

বনজ সম্পদের স্বল্পতার কারণে স্থানীয় উপজাতীয়রা তাদের ধর্ম পরিচালনা ও তাদের সনাতনী অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। বনবৃক্ষ তথা বনায়নের আরো একটি বিশেষ পরিবেশ গুরুত্ব হচ্ছে তার নান্দনিক অবদান। পরিবেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, পরিবেশকে বৈচিত্রময় করে তোলা, বিষন্ন মনের সজীবতা ফিরিয়ে আনা, জটিল সমাজ-সংসারে মানুষের মনকে প্রফুল্ল ও উদারচিত্ত করে তুলতে পারে এই বনভূমি। সুতরাং সামাজিক জীবনেও বনোজাড়ের প্রভাব পড়ছে ব্যাপকভাবে।

বনসম্পদ সংরক্ষণ ও বনায়ন

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশের বর্তমান আর্থপরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রয়োজনে দ্রুত ও ব্যাপক বনায়ন অতীব জরুরী এবং বনায়ন প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিত উপায়ে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, সংগঠন বা সরকারি উদ্যোগ- যেভাবেই বনায়নের পদক্ষেপ নেয়া হোক না কেন, তাতে সামাজিক বনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিৎ। চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের পুনর্বিন্যাস, সমন্বয় ইত্যাদি পদক্ষেপের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। দেশের দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়ও এসব বিষয়সহ বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক ও টেকসই উন্নয়ন ধারণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে প্রণীত পরিবেশ নীতিতে বনায়ন ও বন সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

i) Conserve, develop and augment forest with a view to sustain the ecological balance and meet the socio-economic needs and prevailing realities.
ii) Include tree plantation programme in all relevant development schemes.
iii) Stop shrinkage and depletion of forest land and forest resources, and
iv) Develop and encourage use of substitutes of forest products.

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিও ও ব্যক্তিগত পর্যায়েও বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহায়তায় বন সংরক্ষণ ও বনোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু প্রকল্প নেয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বনায়নের জন্য পরিকল্পনাগুলোতে জোর দেয়া হলেও বাস্তবে তা ফলপ্রসু হচ্ছে না। এর কারণসমূহ তলিয়ে দেখলে পাওয়া যায়ঃ

ক) জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ, ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি।

খ) প্রজাতি-স্থানের যথোপযুক্ততা সঠিকভাবে নির্ধারণ না করা এবং সঙ্গত প্রজাতির মিশ্রণ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

গ) বন-আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি প্রবিধি সংক্রান্ত অজ্ঞতা এবং অপরিকল্পিত ও অননুমোদিত বনোৎসাদন প্রক্রিয়া।

ঘ) দূর্নীতি পরায়ণতা, দায়িত্বহীনতা, লোভী ও অসাধূ ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারীদের সাথে যোগসাজস রক্ষা করার কারণে বনায়ন না হয়ে বরং বনোজাড়ের প্রক্রিয়া হয়েছে ত্বরান্বিত।

তবে বনসম্পদ উন্নয়ন ও অধিকতর বনায়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান ভূমিস্বল্পতা এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার দিকগুলো চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবর্ষিক পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে। একারণেই বনায়নের ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনায় গ্রামীণ বনায়ন, চাষজ বনায়ন, কৃষি বনায়ন, সামাজিক বনায়ন, প্রান্তিক ভূমিতে বনায়ন, উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী, ও Strip

plantations ইত্যাদির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তিক নার্সারি পরিচালনায় ঋণ প্রদান, সংরক্ষিত মূল বনাঞ্চলের চারপাশে বনায়নের মাধ্যমে বাফার অঞ্চল সৃষ্টি, উপকূলীয় অঞ্চলে গ্রীনবেল্ট, বহুমাত্রিক ব্যবহারযোগ্য প্রজাতির বনায়ন ইত্যাদিও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি বাস্তব দিক নির্দেশনা। এছাড়া এডিবির আর্থিক সহায়তায় গৃহীত ফরেষ্ট্রি মাষ্টার প্লান ১৯৯৪ সালে একটি নতুন বননীতি প্রস্তুত করে। এই মাষ্টার প্লানের উদ্দেশ্য হলো মোট এলাকার বনাঞ্চল ৬%-৮% হতে ২০% এ উন্নীতকরণ।

সামাজিক বনায়ন

বনসম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সবচেয়ে যুগোপযোগী পদ্ধতি হলো সামাজিক বনায়ন। এতে স্থানীয় জনগণ বনোজাড়কে প্রতিরোধ করে এবং একই সাথে বনোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কর্মসূচী হাতে নেয়। সামাজিক বনায়নের সার্থক উদাহরণ হলো 'বেতাগী সোস্যাল ফরেষ্ট্রি প্রজেক্ট' যা ছিল 'স্বনির্ভর' বাংলাদেশের একটি কর্মসূচী। এর সফলতার মূল কারণ অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন পদ্ধতিসমূহ যেমন- ভূমিহীন কৃষক শ্রমিক (জরিপ পরিমাণ <৩২ শতাংশ); ভূমির উপর নির্ভরশীলতা; এবং যারা অন্য কোথাও শ্রম বিক্রয় করবে না।

এনজিও-র ভূমিকা

বেসরকারী পর্যায়ে বনায়নের ক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত বনায়নকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার ক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ে এনজিওদের ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। এডাব, ব্র্যাক, প্রশিকা, পৌষ, আরডিআরএস, স্বনির্ভর, ডিইউপি, কারিতাস ইত্যাদি এনজিওসহ ১০০টির বেশি এনজিও সামাজিক বনায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া BCAS (Bangladesh Centre for Advanced Studies), Centre for Sustainable Development (CFSD) সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 'নির্মল পরিবেশের জন্য আমরা' নারীপক্ষ জনগণকে সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ রক্ষায় বনায়নের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মত কঠিন দায়িত্বটুকু পালন করবে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ এবং সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে পরিবেশের সাথে সমন্বিত করে জীবনমান উন্নয়নে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ স্থির করা হয়েছেঃ

ক) দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বাধিতকরণ;

খ) অংশগ্রহণমূলক এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিবেশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ (সমতা তথা লিঙ্গ বিষয়টি বিবেচনা করে দরিদ্রদের সম্পদে প্রবিশাধিকার);

গ) পরিবেশ সংরক্ষণে দ্ররিদ্রদের বিশেষ করে মহিলাদের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিবেশ-বান্ধব কার্যক্রম জোরদার;

ঙ) প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ঘটানো;

চ) পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণ ও ব্যক্তিখাতের সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ;

ছ) মাটি, পানি ও বায়ু সম্পর্কিত পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ;

জ) পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে জনসচেতনতা সৃষ্টি; এবং

ঝ) অনবায়নযোগ্য সম্পদের সংরক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য সম্পদের বৃদ্ধি অব্যাহতকরণ।

বাংলাদেশের জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কর্ম পরিকল্পনা পরিবেশ উন্নয়নে একটি নীতি কাঠামো প্রণয়ন করেছে যার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন;

খ) দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা;

গ) পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয়কারী সকল প্রকার কার্যক্রম চিহ্নিত করণ এবং নিয়ন্ত্রণ;

ঘ) সকল খাতে পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ;

ঙ) সকল প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘ মেয়াদী ও পরিবেশ উপযোগী ব্যবহার; এবং

চ) পরিবেশ সংক্রান্ত সকল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগের কার্যকরী সমন্বয়।

সরকারের বনায়ন নীতি ও বিশ বছর মেয়াদী বনায়ন মহাপরিকল্পনা ছাড়াও জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কর্ম পরিকল্পনা (এনইএমএপি) চূড়ান্ত হয়েছে যা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সকল পর্যায়ের জনগণের পরামর্শে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই এনইএমএপি প্রণয়নে সকল সচেতন লোকদের নিকট হতে পরিবেশ সমস্যার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং এসব সমস্যা সমাধানে তাদের পরামর্শ কাজে লাগানো হয়েছে। এটা পরিবেশ বিষয়ে সরকার, এনজিও এবং জনগণের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে আরো অন্যান্য খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা ও নীতিমালা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং জাতীয় জ্বালানী নীতি।

সুপারিশমালা

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বনোন্নয়নে যতটা না অর্থনৈতিক কারণে জরুরী তার থেকেও বেশি জরুরী প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশগত প্রয়োজনে। প্রয়োজনীয় মাত্রায় বনোন্নয়ন একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে সমৃদ্ধির সোপান সৃষ্টি করে তেমনি এর অপ্রতুলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বনায়ন ও বনোন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ক) বনায়নের জন্য পদক্ষেপসমূহঃ

১) সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন।

২) বন সংরক্ষণে যুগোপযোগী ও কঠোরতর আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন।

৩) বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির অনাবৃত এলাকায় সুষ্ঠু পুনর্জন্ম ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে গবেষণার মাধ্যমে 'স্থান-প্রজাতি'র যথোপযুক্ততা যাচাই এবং রোপণযোগ্য বিভিন্ন প্রজাতির সংগতিপূর্ণ মিশ্রণ' ব্যবহার করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪) উপকূলীয় বনায়নের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং সামুদ্রিক ঘূর্ণীঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য উপকূলের সম্মুখভাবে নারিকেল, খেজুর, তাল জাতীয় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত গ্রীণ বেল্ট সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৫) যে সবএলাকায় বনায়নের সুযোগ রয়েছে সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বনায়ন করা;

৬) গ্রামীণ বনায়ন প্রক্রিয়া আরো জোদরার করা প্রয়োজন। সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদোগে বনায়নে অংশগ্রহণ করার জন্য জাতীয় ও গণ প্রচার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৭) জ্বালানী কাঠের ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে সঙ্গতিপূর্ণ মিশ্রণ আকারে স্বল্পমেয়াদী আবর্তক জাতের বৃক্ষ বা দ্রুতবর্ধনশীল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ও ভূমি ব্যবহার নীতিমালায় বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বনায়নের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা দরকার।

৯) শহর ও নগর বসতির ধরন, ভূমিমূল্য ও ভূমির অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করে পরিবেশ সম্মত ও কার্যকর বনায়নের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

খ) কাঠ ও জ্বালানী কাঠের ব্যবহার কমানোর পদক্ষেপ সমূহঃ

১) চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল থাকা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে জনসাধারণের কাছে সলিড কাঠের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে বিকল্প দ্রব্যাদি যেমন পারটেক্স ইত্যাদির ব্যবহার সম্প্রসারিত করতে হবে এবং জনগণকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২) কাঠ আহরণ ও চেলাইকরণ পদ্ধতির উন্নয়ন সাধান করতে হবে যাতে কাঠ নষ্ট না হয়।

৩) দীর্ঘায়ু করার জন্য কাঠ ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা দরকার।

৪) ১৯৮৯ সাল থেকে ইটের ভাটায় লাকড়ির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৫) কাঠ ব্যতীত বিকল্প জ্বালানী যেমন গ্যাস, তেল, বৈদ্যুতিক চুলা, সৌরচুল্লী ইত্যাদির সরবরাহ ও ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ) সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহঃ

১) প্রশাসনের ভেতর কাঠামো শক্তিশালী ও যথার্থ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২) বন-আইনের যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যার আলোকে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সংশোধিত বন আইনে (১৯৮৯) এগুলোর সংযোজন ঘটাতে হবে।

৩) অসদুপায় ও অননুমোদিত বনোৎসাদনের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) বৃক্ষের রোপণোত্তর পরিচর্যা ব্যবস্থার উপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে এবং তার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

৫) গৃহীত প্রকল্পসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অবমুক্তি প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং গৃহীত প্রকল্পসমূহের সামগ্রিক কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৬) উন্নয়নের সকল পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষার কথা বিবেচনা করে Sustainable Development বা টেকসই উন্নয়নের নিমিত্তে আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৭) বনোজাড়ে বিশ্ব পরিবেশ পরিস্থিতির বিপর্যয় এবং তার কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করে তোলার জন্য জাতীয় প্রচার মাধ্যমসহ ব্যাপক প্রচারের পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের মোট ভূমির ৬-৮ শতাংশ প্রাকৃতিক বনভূমি বিবেচিত যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে অনেক কম। এক জরিপ হতে দেখা যায় বন ধ্বংসের ৫০ শতাংশ গত বিশ বছরে সংঘটিত হয়েছে যা ভূমির উপরের অংশকে প্রভাবিত করছে এবং ভূমি ক্ষয় করছে। এই বন উজাড়করণকে এখনো সামাজিক বনায়ন এবং বসতবাটি সংলগ্ন বনায়ন দ্বারা পূরণ করা হয়নি। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল উন্নয়ন অংশীদার যথাঃ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ভাগ করে দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

তথ্য নির্দেশিকা

GOB (1990) *The Fourth Five Year Plan.* 1990-95. Dhaka : Planning Commission.

GOB (1991) *National Conservation Strategy of Bangladesh-Towar Sustainable Development.* Dhaka : Ministry of Environment & Forest.

GOB (1995) *Participatory Perspective, Plan for Bangladesh* 1995-2010. Dhaka: Planing Commission.

GOB (1998) *The Fifth Five Year Plan.* 1997-2000. Dhaka : Planning Commission.

Hossain, Ekram and Kazi Hasan Imam (2002) *Legal Framework for Environment and Sustainable Agricultural Resource Management in Bangladesh.* Dhaka : BPATC.

Khan, Sadruddin Aga (1986). *The Vanishing Forest.*

ইমাম কাজী হাসান (১৯৯৯) *পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন-বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত।* ঢাকা ঃ প্যারাগণ পাবলিশার্স।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৯) *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা।* ঢাকা ঃ পরিকল্পনা কমিশন।

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার (১৯৯২) *পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম।* ঢাকা ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

সিদ্দিকী, কামাল ও সৈয়দ সালামত আলী (১৯৯৪) *বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা ম্যানুয়েল।* ঢাকা ঃ এনআইএলজি।